আত্মপরিচয়, পরিপ্রশ্ন ও বাংলাদেশের কথাসাহিত্য

সাধন চট্টোপাধ্যায়

কল্পনায় আঁকা যাক, সার্ক-অন্তর্ভূক্ত দেশগুলোর কথাসাহিত্যিকদের যার যার ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক অস্তিত্ব ও সমস্যা নিয়ে কোনো সম্মেলন বসেছে। ভারত তার স্বীকৃত বাইশটি ভাষারই কথাসাহিত্যিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। অবশ্যই আশা করা যায় বাঙালি সাহিত্যিক কিছু অন্তর্ভূক্ত হবেন। বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধিরা আসবেন। হিন্দী, তামিল, মালয়ালাম লেখকদের নিয়ে সমস্যা নেই।

সমস্যা বাংলা এবং কিছুটা উর্দুর। বাংলা ভাষার লেখালিখি আলোচনায় বাংলা ভাষী লেখক হিসেবে কি পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙলাদেশের লেখকরা একই গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হবেন, নাকি আত্মপরিচয় হিসেবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ভিন্ন অবস্থান হবে সেখানে? উর্দুর ক্ষেত্রেও সমানাবস্থা। সামগ্রিক উর্দু ভাষার লেখক হিসেবে সমস্যাগুলো উঠে আসবে, নাকি পাকিস্তান ও ভারতের উর্দু লেখকদের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন?

কেউ কেউ বলতে পারেন, প্রকাশের ভাষামাধ্যম এক হয়েও, বৃটেন, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার সাহিত্য যেমন দেশপরিচয়ে গড়ে উঠেছে, এখানেও তা কেন হবে না। ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক পরিকাঠামো, ইতিহাস ও শাসনব্যবস্থার বৈচিত্র্যের দরুন, সাহিত্যসৃষ্টিওতো ভিন্নতর হবে। যদিও, নর-নারীর সম্পর্ক, প্রেম-ভালোবাসা কিংবা মানবিক আবেদনে, অস্ট্রেলিয়ার প্যাট্রিক হোইট্-এর লেখা পড়ে যেমন আমরা আনন্দ পাই, ডিকেন্স বা মার্কটোয়েন, হেমিংওয়ের উপন্যাসেও আমাদের সত্তা আলোড়িত হয়; উদ্বুদ্ধ হই আমরা যেমন, বোঝা যায় ভাষাগত একতার বাইরেও উপন্যাসের গঠন, মেজাজ ও মননে ফারাক আছে। হাজার হাজর মাইল দূরত্বের ভূখণ্ডগুলোতে, ভাষাগত ঐক্যের বাইরে, সমাজ-সাইকি, রাষ্ট্রব্যবস্থায় ঐতিহ্যের অনৈক্য অনেক বেশি। আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন আদি সভ্যতা ও সংস্কৃতিগুলো নির্মূল বা ধ্বংস করে উপনিবেশবাদ যে কলোনি গড়ে তুলেছিল, রাষ্ট্র-আইন-ধর্ম-অপরাধচরিত্র-বিচার ব্যবস্থা, বর্ণবৈষম্য, আর রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র চর্চার লম্বা ঐতিহ্যের যে ফারাক, নিছক ভাষার ঐক্য তা ঘুচিয়ে দিতে পারে না। তাই একই ভাষামাধ্যম ইংরেজি হয়েও, আমেরিকান সাহিত্য, অস্ট্রেলিয়ান সাহিত্য ভিন্ন আত্মপরিচয় অর্জন করেছে।

তাই, একই বাংলা ভাষা থাকলেও, বাঙালি হয়েও পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য, বাংলাদেশের সাহিত্য ভিন্ন আইডেনটিটি কেন অর্জন করবে না?

এ যুক্তিতে অনেকেই হা হা করে তেড়ে আসতে পারেন। তাদের কথাগুলো এমন হতে পারে, বাপু হাজার হাজার মাইল দূরের ভিন্ন ভূখণ্ড দখলের মধ্যে ভিন্নতর সংস্কৃতি সভ্যতা ধ্বংস করার যে দৃষ্টান্ত দেয়া হল, বাংলা দু-টুকরো হওয়ার পেছনে তো তা ছিল না। শুধু একটা কৃত্রিম তারকাঁটার ব্যবধান। ভাষ্য অধিকাংশই রূপান্তরিত ইসলাম।

সাহিত্যে একই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। মধ্যযুগে বৈষ্ণব পদকর্তা হিসেবে প্রায় চল্লিশজন মুসলমান পদকর্তার নাম যেমন পাওয়া যায়, অসংখ্য হিন্দু আলওয়াল, দৌলত কাজী বা পরাগলি মহাভারত পাঠে তৃপ্তি পেয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা ভাষার মধ্যে

সহাবস্থান করেছে অসংখ্য আরবি-ফারসি-প্রাকৃত শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত তৎসম শব্দ। যা কিছু Antagonistic Contradiction – বা শত্রুতামূলক দ্বন্দ্ব-দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে— উদ্ভব হয়েছে পলাশির যুদ্ধ এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিসম্পর্ক সৃষ্টির পর। যাক, এ-সবতো ক্ষমতা, অর্থনীতি, রাজনৈতিক প্রসঙ্গ।

৪৭ য়ে বাঙলা ভাগের আগে পর্যন্ত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐতিহ্য হিসেবে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র থেকে মানিক-তারাশঙ্কর-বিভূতি-জীবনানন্দ ছিলেন উত্তরাধিকার। এমনকী, এই-সব বরণীয় লেখকদের কারও ভিটে ছিল এপারে কারও বা পূর্ব বাংলায় (বর্তমানে যা স্বাধীন বাংলাদেশ)। এ-যেন কোনো যৌথ পরিবার ভাগ হয়ে, যার যার মতো দেয়াল তুলে দিয়েছে। বৃটেন, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার তুলনা এখানে বেমানান। ভিন্ন ভিন্ন পটভূমি।

এমনকী, বর্তমান বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ভিত যাঁরা প্রস্তুত করেছিলেন, একদা অবিভক্ত বাংলায় একই ধারায় সাহিত্য চর্চা করেছিলেন, দেশভাগের পর ও-পারে চলে গেছেন। বাংলা ভাষা রক্ষায় আন্দোলন করে এরা মর্যাদা রক্ষা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে স্বাধীন বাংলা দেশ গঠন করেছেন এবং পুরনো ভিতের ওপর নানা ডিজাইনের নির্মিত তলবৈচিত্র্যের বহুরূপ লক্ষিত হলেও, আজ যা বাংলাদেশের সাহিত্য, তা ধরতে গেলে বৃহত্তর বাঙালির সাহিত্য। কল্পিত সার্ক-সম্মেলনে রাষ্ট্র হিসেবে পশ্চিমবাঙলা ও বাংলাদেশের সাহিত্যিকরা আলাদা আলাদা চিহ্নিত পোডিয়ামে বসলেও উভয়ই বাঙলা ভাষার সাহিত্য।

এ-যুক্তিরও বিরোধিতা চলতে থাকবে বলে আমাদের মনে হয়। তারা হয়তো বলতে পারেন বৃটেন, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার সাহিত্য যার যার আত্মপরিচয় লাভ করেছে কি নিছক বিপুল দূরত্বের জন্য? দেশ-কাল সমাজের ভিন্নতর কোনো ভূমিকা ছিল না?

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক শহীদ ইকবালের মতে, ... 'সাতচল্লিশ-পূর্বেই বাংলা দেশের কথাসাহিত্য শুরু, পূর্ব-বাংলার লেখকদের হাতে। চল্লিশ দশক থেকেই। উত্তর-কল্লোল সাহিত্য ধারায়। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের বুনিয়াদ গড়ে তোলেন আবু জাফর শামসুদ্দীন, শওকত ওসমান, আবুরুশদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম প্রমুখ।

.... প্রথমেই মাহ্‌বুক-উল্ আলম (১৮৯৮-১৯৮১) এর কথা। বাংলাদেশের গল্পের একেবারে গোড়ায় যে ক'জন বাঙালি মুসলমান জলসিঞ্চন করেছেন তাঁদের অন্যতম মাহ্‌বুব-উল্ আলম। বিভাগ-পূর্বকালে সফিজন (১৯৪৬) লিখে খ্যাতি পান। তা ছাড়া তাজিয়া (১৯৪৬), গাঁয়ের মায়া (১৯৪৯), পঞ্চঅন্ন (১৯৫৩) তাঁর ছোট বড় নানা মাপের গল্প। ... তাঁর বন্ধু 'বুদ্ধির মুক্তি'র পথিকৃত কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) তাজিয়ার মূল্যায়নে বলেন : 'তাঁর কথা সহজেই ব্যক্ত হয় রেখা ও রঙের বৈচিত্র) নিয়ে .... এক ধারায় তিনি মুখ্যত শিল্পী .... অন্য ধারায় এক বিশেষ যুগের ও বিশেষ সমাজের ভাবনায় — অথবা দুর্ভাবনায় তিনিও যে বিব্রত। তার নারীবাদ স্পষ্ট। ....

এরপর আসেন আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)। 'চৌচির' (১৯২৭) উপন্যাস নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। তারপর 'প্রদীপ ও পতঙ্গ' (১৯৪০), 'সাহসিকা' (১৯৪৬)। মুসলিম সমাজজীবন, প্রেম-রোমান্স প্রণয়। .... ছোটগল্পে আবুল ফজল মাটির পৃথিবী (১৯৪০)

র সমাজসচেতন গল্প নিয়ে শক্ত ভিতে প্রতিষ্ঠিত।

আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮) লিখেছেন 'স্বামী' (১৯৪৭), মুক্তি, প্রপঞ্চ প্রভৃতি উপন্যাস।

এরপর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসিকের নাম শওকত ওসমান। বনীআদম, জননী, ক্রীতদাসের হাসি প্রভৃতি প্রতীকী উপন্যাস।

সরদার জয়েন উদ্‌দীন (১৯১৮-১৯৮০), আবু রুশদ (১৯১৯), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, আবু ইসাক প্রমুখ লেখকবৃন্দ দেশভাগপূর্ব এবং দেশভাগোত্তর বাংলায় উল্লেখযোগ্য গল্প-উপন্যাস লিখে বাংলা দেশের কথাসাহিত্যের ভিত গঠন করেছিলেন।

আবু রুশদ ১৯৩৮ সালে 'রাজধানীতে ঝড়' লিখে সাড়া ফেলে দেন; বাঙালি মুসলমান গল্পকার হিসেবে নগর-মনস্কতার নিবিড় পর্যবেক্ষণ, গভীরে অন্বেষন, সর্বোচ্চ অনুভবের মাত্রায় শিল্পিত কাঠামো তৈরি— ওই চল্লিশে, প্রথম আধুনিক আবর্তটি স্পর্শরূপ, সেটি অভিনব।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এঁদের মধ্যে তুলনায় জনপ্রিয় ও শক্তিশালী কথাশিল্পী। ১৯৪৫ য়ে প্রকাশিত 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থ বাংলা গল্পের সম্পদ। উপন্যাস শিল্পেও 'লালসালু', 'চাঁদের অমাবস্যা' এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো' বাংলা উপন্যাসের নতুন বাঁক।

আবু ইসহাক বিখ্যাত তাঁর 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের জন্য।

আর সামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৮) ৪৭-উত্তর পূর্ব-বাংলায় প্রথমও এবং জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক।

এই বর্গের লেখকরা সকলেই দেশভাগ পূর্ব এবং দেশভাগোত্তর সন্ধিক্ষনের লেখক এবং ওয়ালীউল্লাহ ব্যাতিত সকলেই স্বাধীন বাংলাদেশে চাক্ষুষ করে গেছেন।

দ্বিতীয়পর্ব অর্থাৎ দেশবিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্যবর্তীপর্যায়ে যাঁরা উঠে এসে বাংলাদেশের সাহিত্যের ভিতের ওপর নতুন নতুন দালানকোঠা নির্মান করলেন এবং যাঁদের জন্ম দেশভাগের আগে, তিরিশ কিংবা চল্লিশের দশকে, যাদের অনেকেই এপার থেকে ওপারে চলে গেছলেন বা জন্মসূত্রে ওপারেই বড় হলেন, তাঁদের উল্লেখ্য নাম আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৮), শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮), হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯), জ্যোতি প্রকাশ দত্ত (১৯৩৯), সেলিনা হোসেন (১৯৪৭), হুমায়ুন আহমেদ (১৯৪৮-২০১৭), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭), কায়েস আহমেদ (১৯৪৮-১৯৯২), রিজিয়া রহমান (১৯৩৯) প্রমুখ।

এঁদের কলমে পূর্ব পাকিস্তানের দীর্ঘ মিলিটারি শাসন, গণ অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধের লড়াই এবং তিরিশ লক্ষ বাঙালি নিধনে রক্তস্নাত স্বাধীন বাংলাদেশের— নানা পর্যায়ের গল্প উপন্যাস পাই আমরা।

এবং পরবর্তী পর্বগুলোর কথাসাহিত্য নিয়ে কিছু প্রাসঙ্গিকতা টানবার আগে, ফিরে যাই শুরুর বিতর্কে।

যাঁরা উভয় অংশের লেখালিখিকে বৃহৎ বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি দেখতে চান, তাদের বলার কথা এই যে, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের-নজরুলের ঐতিহ্যে যে সৃষ্টির ধারা গড়ে উঠেছে ৪৭ পরবর্তী কালে রাষ্ট্রীয় বিচ্ছিন্নতা ঘটলেও, একই বৃক্ষের ছিন্ন শাখা

তারকাঁটার দুপাশের জনবাতাসে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাই কি? কেউ কেউ তো বলতে পারেন, একই বৃক্ষ বলছি কেন? তিরিশ ও চল্লিশ দশকের বাংলা উপন্যাস-গল্পের যে ইতিহাস কলকাতার বিশিষ্টজনেরা রচনা করেছেন, তাতে কি বাংলাদেশের লেখালিখির গোড়ার ভিত যাঁরা তৈরি করেছিলেন, অন্তর্ভুক্ত? যতদূর স্মরণ হয়, কিঞ্চিৎ ওয়ালি উল্লাহ এবং আবু ইসহাক এর সূর্য-দীঘল বাড়ির উল্লেখ ছাড়া, বাকিসহ অনুপস্থিত। ঐতিহ্যের অংশ কী করে দাবি করব?

তাছাড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবেই পরিবেশ ভিন্নতা ক্রমাগত একটা ফারাক নির্মাণ করে গেছে।

৪৭ এর পর থেকেই উর্দুর রাষ্ট্রীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ৫২ এর ভাষা আন্দোলনে প্রাণের বিনিময়ে বাংলার মর্যাদা রক্ষা করতে হয়েছে ওপারে। পশ্চিমবঙ্গের বাস্তবতায় তা নয়।

৫৪ এর নির্বাচনের পরই, ও-অংশের লেখকরা একনায়কতন্ত্রীয় মিলিটারি শাসন দেখে আসছে, যে-কালপর্বের মধ্যে এ-পারের লেখকরা ছ-ছটি সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিয়েছে।

এর পর ৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান, ৭১ এ মুক্তিযুদ্ধ, পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের হত্যালীলা, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিরীহ মাইনরিটি বা কিছু মেজরিটি সহ তিরিশ লক্ষ খুন হন।

প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী মুনতাসীর মামুন-এর 'মিছিলে কেন ছিলাম' (নীললোহিত, ৭ম বর্ষ ২ এবং ৮ম বর্ষ ১ তম সংখ্যা ২০১১-১২) নিবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে, দু-অংশের সমাজ বৈজ্ঞানিক ভেদরেখা ধরা পড়বে।

'.... আইয়ুব আমল থেকে যে ধারা শুরু হয়েছিল, জিয়া পর্যন্ত তা ঠিকই রইলো। শুধু বদলালো অস্ত্রের আকৃতি, প্রকৃতি। কিন্তু যে কাজটি ঠান্ডা মাথায় জিয়া করলেন তা অকল্পনীয়। তিনি খুনি হিসেবে কথিত মওলানা মান্নান-কে মন্ত্রী করলেন, শাহ আনিনের মতো স্বীকৃত রাজাকারকে প্রধানমন্ত্রী, আলবদর বলে কথিত আবদুল আলীমকে মন্ত্রী। পুনর্বাসিত হল রাজাকার আলবাদর—জামায়াত। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি সারা দেশে একটি পাকিস্তান পাকিস্তান ভাব এনে ফেললেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আদর্শ হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদকে। এটি যদি শুধু রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির ব্যাপার হত তাহলে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু এর মূল উপাদান ছিল ধর্ম। আপত্তিটা ছিল সেখানে। এ কারণে সংবিধানের মূল লক্ষ্য বদল হয়ে গেল। হাতে অস্ত্র থাকলে সাফল্য একজন সেনা অফিসারও কী করতে পারেন—জিয়াউর রহমান তা দেখালেন।

হঠাৎ করে দেখা গেল সেই আমলেই বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান দুটি আলাদা জাতি। একদল মেজরিটি, আরেক দল মাইনোরিটি। ভারত বিভক্তির সময় যে ব্যাপারটি হয়েছিল, পাকিস্তান হয়েছিল যে কারনে, হঠাৎ দেখা গেল বাংলাদেশ হওয়া সত্ত্বেও তা দূর হয়নি। অথচ মুক্তিযুদ্ধের সময় এ প্রশ্ন জাগেনি। সংবিধানও রচিত হয়েছিল শেষ মুজিবের আমলে, এত সংকটের মধ্যেও এ প্রশ্ন জাগেনি। এখন মনে হল দেশ দ্বিধাবিভক্ত করে দেওয়া হল। অমুসলমান যাঁরা গর্ব ভরে দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, হয়তো জিয়ার অধীনেই তাঁরা আজ দেখলেন— পরিত্যক্ত। যেমন পিতা করে পুত্রকে

সাজে'।

মুনতাসীর মামুন-এর এইসব যুক্তি উল্লেখ করে। কেউ কেউ বলতে পারেন,

১. একই আপেল বৃক্ষের শাখা হলে, আদি বৃক্ষের ইতিহাস রচনায় বিশেষ বৃক্ষটির উল্লেখ নেই কেন, যাঁরা ফল-ফুল-কুঁড়ি নিয়ে দেশভাগের উত্তরপর্বে ওপারের সাহিত্যের ভিত নির্মাণ করেছিল?

২. ধরেও যদি নেই, ঐতিহ্যে একই আপেলবৃক্ষের শাখা, ভিন্ন চরিত্রের মাটি এবং বিপরীত আবহাওয়ায় শাখাটি থেকে যে স্বাদের ফল ধরল, তা মোটেই আপেল নয়, নাম এক রেখেও, চরিত্রে আপেলের মতো হলেও, স্বাদে ভিন্ন।

আমাদের অনুমান এসকল যুক্তি নিয়ে যারা বাংলাদেশের সাহিত্যকে পশ্চিমবাঙলার থেকে কিছুটা ভিন্ন আইডেনটিটি দিতে উৎসাহী, ঐ জিয়া প্রবর্তিত 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ তত্ত্বে কিছুটা আবেসিত। এমন ধারণ সঠিক না বিভ্রান্ত, ভবিষ্যৎ বিচার করবে।

আমরা এবার ভিন্নপন্থীদের যুক্তিতে আসি। তাদের মতে, বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া কিংবা আফ্রিকার নানা দেশে বর্তমানে ইংরিজিতে সাহিত্য রচিত হচ্ছে। নাইজেরিয়ার চিনুয়া আচেবে যেমন আছেন বৃটেনে আছে সলমন রুষদি, ভারতে অরুন্ধতি রায়, অনিতা দেশাই প্রমুখ। এদেশে উল্লেখ করা হয় ভারতীয় ইংরাজি লেখক হিসেবে। দেশ-সমাজের ভিন্নতা এখানে নিয়ামক হচ্ছে না, মূল কাজ ইংরিজি ভাষা। এরই ভিত্তিতে বুকার পুরস্কার চালু রয়েছে। দেশ ও জাতীয়তাবাদের তকমা এঁটে সাহিত্য-সৃষ্টিকে খন্ডিত রাখা আধুনিক বিশ্বপরিস্থিতিতে একপা পিছিয়ে যাওয়া।

বস্তুত, জিয়াসৃষ্ট 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ-এর সীমা ভেঙে ওপারের সঙ্গে এ-দেশের গ্রন্থ আসা যাওয়ার নিষেধ তুলে দিলে, সহজ বাজার তৈরি করা গেলে, কলকাতায় বাঙালি পাঠক খুবই উৎসাহিত হবে। পশ্চিমবাংলার সাহিত্য, বাংলাদেশের সাহিত্য, ত্রিপুরার সাহিত্য, অসমের বাংলা সাহিত্য—এমনকী অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন-যে সম্প্রতি বাংলা ভাষা স্বীকৃতি লাভ করায় বিপুল অভিবাসী বাঙালি সমাজ যদি ভবিষ্যতে গল্প উপন্যাস লেখে, তা হবে অস্ট্রেলিয়ার বাংলা সাহিত্য। এমন কী আমেরিকা বা বৃটেনের বাংলা সাহিত্যও হতে পারে। ভবিষ্যতে, বুকার-এর মতো বাংলা সাহিত্যেরও আন্তর্জাতিক কোনো পুরস্কারের নাম ঘোষিত হতে পারে। শুনেছি বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা পড়ানো হয়। যদি ওখানে ভবিষ্যতে কোনো চিনা ছেলেমেয়ে বাংলায় সাহিত্য রচনা করে, তা কি বাংলা ভাষায় বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

মনে হয় বাঙলাদেশে পরবর্তী প্রজন্ম, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ উত্তরকাল থেকে নিজেদের সাহিত্য চর্চায় নিয়োজিত রেখেছেন, এমন চিন্তারই শরিক হয়ে উঠছেন, কারও কারও সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপে অথবা তাঁদের সৃষ্টির আকরণ-প্রকরণে এমনই বিস্তৃত একটি চেতনার সাক্ষ্য পাই।

পরবর্তী এই প্রজন্মের থেকে প্রথমেই শহীদুল জহির-এর নাম করতে চাই। তাঁর 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' বা 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল' উপন্যাস এবং ডলুনদীর হাওয়া ও কিছু গল্প আমাদের স্তব্ধ মুগ্ধ করে তোলে। তাঁর অকাল প্রয়াণে বাংলা কথাসাহিত্য দারুন ক্ষতিগ্রস্থ। এ-ছাড়াও চলমান প্রজন্মর কিছু কিছু নাম চটজলদি মনে আসছে।

তবে, নিজের অক্ষমতা জানিয়ে বলছি, যেহেতু বাংলা সাহিত্য পশ্চিমবঙ্গের মতো একমাত্র-কলকাতাকেন্দ্রিক নয় ওপারে—ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট নানা অঞ্চলে বিভক্ত এবং পত্র-পত্রিকা এবং গ্রন্থের সহজ লভ্যতা নেই নানা বাধানিষেধের জন্য, নামোল্লেখে হয়তো সত্যিকার গুণীজন-রা বাদ পড়ে যান। তাঁদের হয়ে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

যাদের লেখা একটু-আধুটু পড়বার সুযোগ পাই, পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা কেউ এলে পরিচিত হই কিংবা পুরনো কোনো সূত্রে আমার প্রিয়জন হয়ে গেছেন, কিছু নাম উল্লেখ করছি। ওয়াসি আহমেদ, মঞ্জু সরকার, জুলফিকার মতিন, নাসরিন জাহান, সুশান্ত মজুমদার, হরিপদ দত্ত, জাকির তালুকদার, হরিশংকর জলদাস, অদিতি ফাল্গুনি, মামুন হুসাইন বা মনিরা কায়েস প্রমুখ ওপারের বাংলা সাহিত্যকে নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা ঘাতবল দিয়ে চলেছেন। ব্যক্তিগতভাবে খুলনার স্বল্পখ্যাত অচিন্ত্য ভৌমিক-এর বেশ কিছু গল্পে পাঠক আকর্ষণের মশলা লক্ষ্য করা যায়। ইদানীং চন্দন আনোয়ারও উল্লেখযোগ্য গল্প লিখছেন। তবে, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক গদ্যের গতিমুখ কেমন, তা ওপারের ক্রিটিকরা বলবেন। শুনেছি, ইদানীং ওপারেও নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিশ্বায়ন বা পোস্টমডার্নিজম এর হাওয়া প্রবল। এ নিয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই। তবে, আজ থেকে প্রায় চোদ্দ বছর আগে, বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়াতে এসেছিলেন হাসান আজিজুল হক। তখন তাঁর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। নিয়েছিল আমার স্নেহধন্য গবেষক তুষার পণ্ডিত। আমি তা থেকে ছোট একটি অংশ তুলে দেব।

তুষার ঃ আপনি পোষ্টমডার্নিজম ব্যাপারটা মানেন?

হাসান ঃ আমি তো মানিই না। প্রথমত আমার প্রশ্ন তুমি কি ইউরোপে বাস করো? তুমি কি ফ্রান্সের বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত? তুমি কোথায় পড়ে রয়েছ ভেবেছো? আমাদের দেশের লোকেরা তত্ত্ব পড়তে শেখেনি। প্লেটো থেকে শুরু করে কেউই শেষ পর্যন্ত ইনডিপেন্ডেন্ট অফ সোসাইটির কথা লিখতে পারেনি। ফলে হয় কি জানো, বিভ্রান্তির সুক্ষ্মজালে নতুন লেখকেরা অনেকে আটকে পড়ে। তাদের ছেড়ে দাও, তারা নিজের মতো করে ভাবুক।